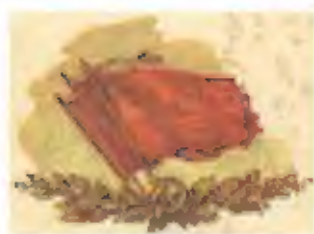




নাদেব্দা ত্রুপ্কারা
ভ্লাদিমির ইলিচ
লেনিন







নাদেব্দা ত্রুপ্‌স্কায়া

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন



প্রগতি প্রকাশন • মস্কো



ঘরের দেয়ালে একটা ছবি ঝুলছে।

ভাসিয়া জিজ্ঞেস করে বাবাকে:

— বাবা, ঐ ছবিটা সম্পর্কে কিছু বলো না।

— তুমি জানো, উনি কে?

— জানি। উনি তো লেনিন।

— ঠিক, উনি হলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। আমাদের প্রিয়,
পরমাত্মীয় নেতা।



হ্যাঁ, তারপর শোনো। তখন আমি ছোটো। সে-সময় আমাদের, শ্রমিকদের, অবস্থা খুব খারাপ ছিল। খুব পরিশ্রম করতে হতো। কাজ করতাম সেই সকাল থেকে রাত অবধি, অথচ বেঁচে থাকেই আধপেটা খেয়ে। আমাদের মধ্যে অনেকেই কলকারখানায় কাজ করতো। কারখানার মালিক ছিল দানিলোভ্‌। সে কিছু কাজ করতো না। হাত দিয়ে কুটোটি লরাতো না, অথচ — ওহ্ — কী বড়লোকই না ছিল লোকটা!

এক কিছ্‌ তার এলো কোথেকে? তার জন্যে কাজ করেছি তো আমরা। কাজের জন্যে পয়সা কম দিতো আমাদের — এক কথায়, ডাকাতি করতো বলতে গেলে। আমাদের খাটুনির উপর দিয়ে মদ্যমাগা লুটতো সে। কারখানাটা ছিল তার, সেই সাথে চাকানস্যা, গাড়িঘোড়া — সব; আর



আমাদের — কিছুটি না, সম্বল বলতে এক এই খেটে খাওয়ার হাত
দুটি ছাড়া আর কিছুই না।

আর তাই, তার কাছেই যেতে হতো কাজের জন্যে। দানিলোভের
কারখানাই শুধু যে এরকমটি ছিল, তা নয়, সব কলকারখানা আর
ফ্যাক্টরীতেই ঐ একই অবস্থা।

পাড়া-গায়ে চাষীদের অবস্থাও ছিল খুব খারাপ। তাদের নিজেদের
জমি ছিল অল্প, অথচ জোতদারদের — অ-নে-ক। চাষীরা জোতদারদের
জন্যে খেটে মরতো। অথচ জোতদারেরা বড়লোক, আর চাষীরা গরিব।

জোতদার আর মহাজন ছিল একেবারে গলায়-গলায় এক। তাদের
সাথেই এক কাতারে ছিল সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে ধনী জোতদার —
আর সম্রাট। সবার উপরে মালিক ছিল সে। এমন নিয়মই সে চালু



করেছিল যাতে কেবল জোতদার আর মহাজনদেরই ভাল হয়। এদিকে ঐ নিয়মের ঠেলায় চাষী-মজুরদের জীবন অত্যন্ত কষ্টের হয়ে উঠেছিল।

জার্মানির ইলিচ লেনিন ছিলেন মজুরদের বন্ধু, তাদের সাথী। সব নিয়মকানুন পাশে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন যাতে সবাই — যারা কাজ করে তারা যেন ভাল ভাবে বাঁচতে পারে। মজুরদের স্বার্থ নিয়ে লড়তে লাগলেন লেনিন।

যারা মজুরদের পক্ষে আছে, তাদের সকলকে জড়ো করতে লাগলেন লেনিন। তাদের সংখ্যা যত বাড়তে লাগলো, ততই শক্তিশালী হতে লাগলো মজুরদের দল — কমিউনিস্টদের পার্টি।





পার্টি দেখল যে, যুদ্ধ ছাড়া কিছুটা আদায় করা যাবে না। পৃথিবীর
সব দেশের মজদুররাই এ কথাটা বুঝতে শুরু করলো।

লেনিনকে ভালবাসতে লাগলো মজদুররা, আর ঘৃণা করতে লাগলো
তাকে জোতদার আর মহাজনদের গোষ্ঠী। জারের পুলিশ গ্রেপ্তার করলো
তাকে, জেলে পুরলো, নির্বাসন দিলো সুন্দর সাইবেরিয়ায়, চিরকাল
জেলে ধরে রাখতে চেয়েছিল তাঁকে। লেনিন দেশ ছেড়ে চলে গেলেন,
কিন্তু দূরে বসেই মজদুরদের কী করতে হবে তা জানিয়ে তাদের চিঠি
লিখতে লাগলেন। আর ভারপরে, ফের ফিরে এলেন তিনি, সংগ্রাম
পরিচালনা করতে লাগলেন।





১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে — তখন যুদ্ধ* চলছে — মজুদেরা
সৈন্যদের সাথে মিলে তাকিয়ে দিলো জারকে আর তারপর, ১৯১৭-র
৭ই নভেম্বরে জোতদার আর মহাজনদেরও তাড়ালো দেশ
থেকে।

জমি কোঁড়ে নিলো তাদের, পরে কলকারখানাও, এবং নিজেদের
নিয়ন্ত্রকানুস চালু করে দিলো দেশে।

* প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—১৯১৮)। — অনূঃ





জরুর নয়, জোড়দার নয়, মহাজন নয় — কেউ না, চাষী-মজদুর নিজেরাই নিজেদের ব্যাপার-স্বাপার আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে লাগলো নিজেদের সভায় বা 'সোভিয়েত'-য়ে।

এটা তাদের কাছে একটা নতুন কাজ হয়ে দাঁড়ালো। লেনিন আর তাঁর পার্টি চাষী-মজদুরদের এই কঠিন রাস্তায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন, নতুন জাবে বাঁচতে সাহায্য করলেন তাদের। লেনিনের কাজের বিরাম ছিল না। চিন্তার শেষ ছিল না তাঁর। স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগলো, অবশেষে ১৯২৪ সালে জুলাইমাসে হেলিচ পরলোক গমন করলেন।





লেনিনের মৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু যে বাণী তিনি
রেখে গেছেন তা আমরা কখনো ভুলব না। তিনি যা উপদেশ দিয়ে গেছেন
তা ঠিক ঠিক ভাবে করতে আমরা চেষ্টা করে যাব। আমাদের কাজ আর
জীবন নতুন ভাবে তৈরী করে যাচ্ছি আমরা।



স্বদেশৰূপা কমত্ৰাভিমত্ৰা কৃৎসনকাৰা (১৮৪১-১৯০১) ছিলেন
মহামতি মৌনিনক শ্ৰী ও অন্তৰঙ্গ সহযোগী। সৌকিৰেত্ৰ মেল ও বিপ্লৱ
মহান নেতা সম্পৰ্কে ছোৱালৈৰে জনে এ-বহীৰি ভিৰি মিৰে দেখে।
যাৰা শ্ৰীমত্ৰা যাবা চাৰী কামেৰ কাঁ কবল বিপ্লৱ বহু ছিলেন ভাৰ্য্যমৌনক
ইতিহাস মৌনিন কৌমতী মাদ্ৰুত্ৰ কৌকে কৌমল কৌমলক, সেই মাদ্ৰু
কৌমলক জনে কৌমলক কৌমলক কৌমলক কৌমলক।

মৃত্ৰ মৃত্ৰ মৌকে অন্ত্ৰাম: কৌমলক মাদ্ৰু
কৌমলক: ই. কৌমলক

— KOUKAL
KOUKAL KOUKAL
KOUKAL KOUKAL

© কৌমলক মৌকে অন্ত্ৰাম: কৌমলক মাদ্ৰু
কৌমলক: ই. কৌমলক